শীত আসিল। খোলার ঘরে খাটুনির বিরাম নাই। শরৎকাল হইতেই এবৎসর বিষম বাদল চলিতেছে, এবং তাহার প্রভাব গাবের স্বাস্থ্য বিশেষ ভাবেই অনুভব করিতেছিল। তাহার পিঠের শিরদাঁড়া কনকন করে, জ্বর হয়, মাথা ধরে। ডাক্তার তাহাকে দেখিয়া গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়িল এবং তাহাকে সমুদ্রের ধারে লইয়া যাইবার জন্য পুনরায় ব্যবস্থা করিল। এবার যাইতেই হইবে; যা থাকে বরাতে যত টাকাই লাগুক বসন্তের বাতাসে সমুদ্রবেলায় গাবকে লইয়া বেড়াইতেই হইবে। সেলাইয়ের কল ঝিল্লিঝঙ্কারে দ্রুততর চলিতে লাগিল—রাতদিন দিনরাত! তাহারা গাবকে সান্ত্বনা ও সবুর করাইবার জন্য একখানি রঙচঙে ছবির বই কিনিয়া দিয়াছে, তাতে শুধু সমুদ্র-দেশের ছবি—মাস্তুলের অরণ্যে সজ্জিত বন্দর, তীক্ষ্ণচূড় খণ্ডশৈল ফেনিল শুভ্র তরঙ্গে তরঙ্গে পরিস্নাত, শাদা পাখীর ঝাঁকের মতো পাল-তোলা জেলেডিঙি সমুদ্রময় ছড়ানো!

সমুদ্রের কথা ছাড়া গাবের মুখে অন্য কথা নাই; সে ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া স্বপ্নে দেখে সমুদ্র; সারাদিন জাগিয়া বসিয়া উঠানের উপর ধূসর কোয়াসার জটল্লা দেখিয়া মনে করে সমুদ্রের তটবালুকায় স্ফীত তরঙ্গ গড়াইয়া যাইতেছে, ফুলো পালের নৌকাগুলি তরঙ্গের সহিত আন্দোলিত হইতেছে। সে থাকে থাকে একটি শঙ্খ লইয়া কানের কাছে ধরিয়া স্থির নেত্রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সমুদ্রের চিরন্তন গর্জ্জন শঙ্খের মধ্যে স্তব্ধ হইয়া শোনে। সুদূরের সমুদ্রগর্জ্জন শঙ্খের মধ্যে স্পন্দিত হইতে সে শুনিতে পায়।

শীত এবার স্যাঁতা আর বিষম কনকনে। আমি আর গাবকে তাহাদের দরজায় বসিয়া থাকিতে দেখিতে পাই না। ডাক্তার তাহাকে ঠাণ্ডায় বাহির হইতে বিশেষ করিয়া বারণ করিয়াছে। কখনো কখনো জানলার পর্দ্দা সরানো থাকিলে আমি তাহাকে দেখিতে পাইতাম—তাহার বসা চোখের বিষণ্ণ দৃষ্টি শূন্যে সন্তরণ করিয়া ফিরিতেছে, আর আলোকিত শাসির গায়ে তাহার শীর্ণ আঙুল নৌকার অস্পষ্ট প্রতিরূপ অঙ্কনের চেষ্টা করিতেছে। হঠাৎ আমার ঘরের জানালায় দৃষ্টি পড়িলে, আমি তাহাকে দেখিতেছি দেখিয়া, সে বিরক্তির সহিত জানলার পর্দ্দাটা টানিয়া দিত।

চৈত্রের মাঝামাঝি। আমি আর তাহাকে জানলার শাসির ধারেও দেখিতে পাই না। তাহার শিরদাঁড়া তাহাকে আর দাঁড়াইতে দিতেছিল না, তাহার দুর্ব্বল পা তাহাকে আর বহন করিতে পারিতেছিল না, তাহার মস্তকের ভারে শীর্ণ গ্রীবা ভাঙিয়া পড়িতেছিল। সে সমস্ত দিন তাহার ছোট বিছানাটিতে শুইয়া কাটায় আর দিনের মধ্যে শতেক বার ছবির বইখানির পাতা উল্টাইয়া সহস্র-বার-দেখা সমুদ্রের ছবিগুলি সে দেখে। সে এখনো সমুদ্রযাত্রার আশা ছাড়ে নাই। থাকিয়া থাকিয়া সে তাহার দিদিকে জিজ্ঞাসা করে—"দিদি, আমরা কবে যাব?" দিদি তাহাকে আদর করিয়া বলে—"যাব ভাই যাব, শিগ্‌গির যাব, তুমি আগে একটু ভালো হও।" ইহা শুনিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে গাব উত্তর করিত—"সেই জন্যেই তো আমি ভালো হতে ইচ্ছে করছি। কিন্তু চটপট কৈ সারছি দিদি? দিদি, তুমি যে কাঁদ আমি দেখতে পারিনে, আমি তো শিগগিরই সারব!" তারপর সে দিদির সঙ্গে সমুদ্রের গল্প জুড়িয়া দেয়—কোন্ কোন্ শহরের পাশ দিয়া কোন্ কোন্ দেশের ভিতর দিয়া সমুদ্রে পৌছিতে হইবে সব তাহার মুখস্থ। শেষকালে সে বলে—"একবার কোনো রকমে সমুদ্রে গিয়ে পড়তে পারলে হয়, তারপর আর আমার কোনো অসুখ থাকবে না।" এবং উষার আভার মতো শঙ্খটি কানের কাছে তুলিয়া ধরিয়া সেই সুদূরের সমুদ্রের শব্দ একমনে শোনে—যাহার দর্শন পাইলে তাহার আর কোনো গ্লানি কোনো অসুখ থাকিবে না।

বৈশাখ মাস। আমি আর সেলাই-কলের ঘর্ঘর শব্দ শুনিতে পাই না। খোলার ঘরে সেলাই আর হয় না। কিন্তু প্রদীপের আলো একটি জানলা দিয়া সোনালি আভায় আভাস দেয় যে পীড়িত শিশুর শয্যাপার্শ্বে নিশীথ জাগরণের বিরাম নাই।

একদিন প্রভাতে উঠিয়াই দেখিলাম একটি ছোট কফিন তাহাদের ঘর হইতে বাহির হইল, তাহার পশ্চাতে শোককাতর গাবের আত্মীয় স্বজন।

এতদিনে ছোট্ট গাব সকল রোগযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া একাকী অনন্ত অজ্ঞাত মহাসমুদ্রের পথে যাত্রা করিয়া বাহির হইল।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিকাশ

যেদিন ফুটল কমল কিছুই জানি নাই—
আমি ছিলাম অন্যমনে!
আমার সাজিয়ে সাজি তারে আনি নাই
সে যে রইল সঙ্গোপনে।
মাঝে মাঝে হিয়া আকুলপ্রায়,
স্বপন দেখে চম্‌কে উঠে চায়,
মন্দমধুর গন্ধ আসে হায়
কোথায় দখিন সমীরণে॥

ওগো সেই সুগন্ধে ফিরায় উদাসিয়া
আমায় দেশে দেশান্তে।
যেন সন্ধানে তার উঠে নিশ্বাসিয়া
ভুবন নবীন বসন্তে।
কে জানিত দূরে ত নেই সে,
আমারি গো আমারি সেই যে,
এ মাধুরী ফুটেছে হায়রে
আমার হৃদয়-উপবনে॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কষ্টিপাথর

ভারতী (শ্রাবণ)।

আমার বাল্যকথা—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আমার পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুরকে আমার ঝাপসা ঝাপসা মনে পড়ে। আমরা যখন নিতান্ত শিশু তখন তিনি বিলাত যান; তাঁর মৃত্যুর খবর যখন এদেশে আসে তখন আমরা বোটে গঙ্গার উপর ঝড় তুফানে মার কাছে জড়সড়। সে ১৭৭৮ শকে, ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে। তখন তাঁর বয়স ৫১ বৎসর। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র নগেন্দ্রনাথ ও আত্মীয় নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর মৃত্যুসময়ে নিকটে ছিলেন। লণ্ডন সহরের প্রান্তবর্ত্তী Kensal Green নামক গোরস্থানে তাঁর সমাধি হয়। পিতা বিশেষ মনোযোগ দিয়ে বিষয়কর্ম্ম দেখতে পারতেন না, এজন্য সম্পত্তি নষ্ট হবার আশঙ্কা করে পিতামহ পিতাকে লেখেন যে তুমি পাদ্রিদের সঙ্গে বাদপ্রতিবাদে আর সংবাদপত্রে লিখতে ব্যস্ত থাক, বিষয়ের ভার থাকে আমলাদের হাতে এতে বিষয় নষ্ট হয়ে যাওয়া আশ্চর্য্যের কথা নয়। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে পিতামহ Worthing নামক বন্দরে গিয়ে একমাস যাপন করেন। তখন তাঁর সঙ্গে ১৭ জন অনুচর, ১ জন সেক্রেটারি, একজন দোভাষী, ১ জন সঙ্গীত-ওস্তাদ, ও ১ জন চিকিৎসক ছিল। তাঁর ভৃত্য হলি কারি-ভাত তৈরি করত, তাই এবং একটু কমলা লেবুর জেলি মাত্র তাঁর আহার ছিল। একটি সুন্দর কাশ্মীরী শাল তাঁর গায়ে থাকত। তাঁকে দেখবার জন্য মহিলারা দলে দলে এসে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকতেন। সম্ভ্রান্ত মহিলারা পর্য্যন্ত তাঁর তত্ত্ব নিতেন। তিনি অমায়িক সৌজন্যে সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করেছিলেন। পীড়ার প্রকোপেও তাঁর ধৈর্য্যচ্যুতি হয় নি। স্বদেশী আচার ব্যবহারের অনুরক্ত ছিলেন। তাঁর ভৃত্য হলি আলবোলায় তামাক সেজে দিত; মসলার ডিবে সর্ব্বদা সঙ্গে থাকত। গরম মোটে সহ্য হত না, জানলা খুলে শুতেন, প্রত্যহ প্রাতঃস্নান করতেন, বরফজল খেতেন। হলি তাঁর শয়নকক্ষের পাশের ঘরেই থাকত, তিনি শয়ন করলে সে পায়ে হাত বুলিয়ে দিত। কেহ তাঁকে কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করলে তিনি মৃত্যু আসন্ন জেনেও বলিতেন I am content, তার পরে লণ্ডনে ফিরে এসে তাঁর মৃত্যু হয়।

মেজকাকা ও ছোটকাকাকে (গিরীন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ) আমার বেশ মনে পড়ে। বাবামশায় যখন কোথাও বেড়াতে যেতেন তখন কখনো কখনো আমাদের সঙ্গে নিয়ে যেতেন। আমরা মার কাছে বেশিক্ষণ থাকতাম না—আমাদের আসল আড্ডা ছিল মেজকাকিমার ঘর; সেই আমাদের শিক্ষালয় ও বিশ্রামস্থান; মেজকাকিমাই আমাদের মাতৃস্থানীয়া ছিলেন। হাতেমতাই, লয়লামজনু, নবনারী, আরব্য-উপন্যাস, ল্যাম্ব্‌স্ টেল, পল ভার্জ্জিনিয়ার অনুবাদ প্রভৃতি বই আমরা তাঁর নিকট হতে নিয়ে পড়তাম। কাকিমা প্রভৃতি বাড়ীর মেয়েরা কেহ কেহ বেশ বাংলা জানতেন। ব্যামোর সময় আমরা মার কাছেই থাকতাম। তখন আমাদের মাঝে মাঝে বাঁধা নিয়মে তিনদিনব্যাপী একরকম জ্বর হ'ত; ডাক্তার দ্বারি গুপ্ত ব্যবস্থা করতেন প্রথম দিন রেড়ির তেল, আর তার চেয়েও বিস্বাদ জলসাগু; দ্বিতীয় দিন এলাচ-দানার মতো কিছু লঘু পথ্য; তৃতীয় দিন ফুলকো রুটি; চতুর্থ দিন ভাত। ডাক্তারকে দেখলেই আমাদের প্রাণ উড়ে যেত। তখনকার কালে ব্যামোর সময় হাওয়া বদলের জন্যে বরাহনগর, হুগলি, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থানে লোকে যেত। এখন সেইসব স্বাস্থ্যকর স্থান ম্যালেরিয়ার আবাস হয়েছে।

ছোটকাকা (নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর) গৌরবর্ণ তেজীয়ান সুশ্রী পুরুষ ছিলেন কিন্তু বড় কড়া মেজাজের লোক বলে মনে হত, আমরা তাঁকে ভয় করে চলতুম। তিনি দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে বিলেত গিয়ে নানা স্থানে ভ্রমণ করে বেড়াতেন; তাঁর রূপলাবণ্যের দরুন তিনি সাহেববিবিদের প্রিয়পাত্র ছিলেন, প্রবাস থেকে সহজে স্বদেশে ফিরতে চাইতেন না। অথচ তিনি ইংরেজ জাতের বণিকবৃত্তি ও চালচলন ঘৃণা করতেন। ছোটকাকার কাছে রমাপ্রসাদ রায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র এবং বজলল করিম ও বজলল রহিম আসা যাওয়া করতেন। বিলাত থেকে ফিরে আসার পর কার ঠাকুর কোম্পানির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে কোম্পানির হাউস ফেল হওয়াতে তিনি ঋণভারে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। তিনি ও তাঁর মধ্যম ভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথ উভয়েই স্বভাবত ব্যয়শীল ছিলেন। নিজে ঋণ করে তাঁরা অপরের সাহায্যও করতেন। ১৮৫৪ সালে তিনি কষ্টমস্ কালেক্টারের সহকারীর পদে